অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মধু সাধুখাঁ* : উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ : *মধু সাধুখাঁ* অমিয়ভূষণ মজুমদারের একটি ছোট আকারের উপন্যাস। টেক্সটের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এর ঘটনাকাল ১৫৮৬ ইসায়ি সাল। পুরনো কালের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে প্রভাবিত হই বর্তমানের ভাব-স্বভাব দ্বারা। একদা উপনিবেশিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে এর সাথে আরো দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে যায়। একদিকে উপনিবেশ আমলে জাত মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক বর্গগুলো আমাদের কল্পনা ও অনুমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে; অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী জোশে অতীতের উপর কল্পিত 'খাঁটিত্বে'র বা 'ঐশ্বর্যে'র নানামাত্রিক চিহ্ন যুক্ত হতে থাকে বিবরণীতে। উপন্যাস প্রণয়নকালে ঔপন্যাসিক এসব উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের ব্যাপারে গভীরভাবে সতর্ক ছিলেন বলেই মনে হয়। উপনিবেশ আমলের আগের এক বাস্তবতা চিত্রিত-চিহ্নিত করতে গিয়ে অমিয়ভূষণ এমন এক আয়োজন করেছেন, যেখানে এক ধরনের তুলনা ও প্রতিতুলনা বেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তা ও রীতিপদ্ধতি যেসব বিষয়কে বিশেষভাবে বিবেচ্য ভেবেছে, তার অনেকগুলো লেখকের সচেতন নির্মিতির অঙ্গীভূত ছিল বলেই প্রমাণ মেলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধে *মধু সাধুখাঁ* পঠিত হয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠপদ্ধতি মোতাবেক। এই পাঠপদ্ধতির কোনো সার্বিক সূত্রায়ণ না করে কেবল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসটির বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে। দেখানো হয়েছে, এমনকি নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের ক্ষেত্রেও এ উপন্যাস পড়ার কালে উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠপদ্ধতি অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

১

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) বাংলা কথাসাহিত্যের সেই তিন লেখকের একজন যাঁদের বলতে পারি উপনিবেশিত কলকাতা এবং উপনিবেশ-আমলে গড়ে ওঠা বাংলা কথাসাহিত্যের এন্টিথিসিস। অন্য দুজন যথাক্রমে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এবং দেবেশ রায় (জ. ১৯৩৬)। কমলকুমার মজুমদার স্পষ্টতই উনিশ শতকের উপনিবেশিত আধুনিকতার ব্যাপারে তাঁর অনীহা ঘোষণা করেছেন। উপন্যাসে পরোক্ষে (রাঘব ২০০৫), আর প্রবন্ধে-নিবন্ধে সরাসরি (কমলকুমার ২০০৯) তিনি তাঁর যুক্তি, অনুভূতি ও মত উপস্থাপন করেছেন। দেবেশ রায় (১৯৯১) ঔপনিবেশিক উপন্যাসতত্ত্বের বিশদ সূত্রায়ণ করে উপনিবেশপূর্ব সাহিত্যকর্মে সন্ধান করেছেন

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপন্যাসের নতুন ধরন (২০০৬)। নিজের লেখালেখিতেও 'উপন্যাসে'র বদলে লিখতে চেয়েছেন 'বৃত্তান্ত' কিংবা 'প্রতিবেদন'। অন্যদিকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের বেশিরভাগ রচনায় উপনিবেশিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রবণতা, অনুমান, মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে হাজির হয়েছে এমন এক আলাদা পরিসর, যেখানে বি-উপনিবেশিত বাস্তব এবং মনস্তত্ত্বের পরিচয় মেলে। এই স্বাতন্ত্র্য মোটেই কেবল আলাদা নান্দনিকতার অনুসন্ধান নয়, বরং এর গোড়ায় আছে জীবনকে উপলব্ধি করার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি। সঙ্গত কারণেই অমিয়ভূষণের উপন্যাস উত্তর-ঔপনিবেশিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী পঠিত হওয়ার উর্বর ক্ষেত্র।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তা ও চর্চার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ফ্রান্জ ফানোঁ (১৯৬৩; ১৯৬৮) এবং এইমে সেজায়ারের (২০০০) উপনিবেশ-বিরোধী গ্রন্থে, আলবেয়ার মেমির (১৯৭৬) লিপ্ত লেখালেখিতে। এডওয়ার্ড সাইদের বিখ্যাত গ্রন্থপরিসরে (১৯৯৪, ১৯৯৫) সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার গভীর প্রভাবক দিকগুলো স্পষ্ট হয়েছে। মূলত *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) গ্রন্থের প্রভাবেই উপনিবেশ-অধ্যয়ন শাস্ত্র দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে, এবং আশির দশকের মধ্যেই শাস্ত্র হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, হোমি কে. ভাবা, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর মতো অনেক লেখক উপনিবেশের বহুমাত্রিক প্রভাবের বিস্তৃত ফিরিস্তি তৈরি করেন।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব কাজ করে বিস্তৃত পরিসরে — স্থান, কাল, বিষয় এবং প্রণালি-পদ্ধতির দিক থেকে এর পরিধি এত ব্যাপক যে একে একটি তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করাই হয়ত সঙ্গত নয়। উপনিবেশিতের সাহিত্যকর্মে ঔপনিবেশিক শাসন যে অনপনেয় ছাপ রেখে যায় তার স্বরূপ উদঘাটন এর বিষয়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশ শেষ হওয়ার পরেও উপনিবেশিতের রচনায় উপনিবেশ-আমলের চিহ্নগুলো যেভাবে সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থেকে যায়, তার তত্ত্বতালাশ করাও এর আওতাভুক্ত। অন্যদিকে আছে উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে সে প্রতিরোধ চলতে থাকে আসলে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই। স্বভাবতই উপনিবেশিতের সাহিত্যকর্মেও তার প্রতিফলন থাকে। উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব এসব বি-উপনিবেশায়নের বহুমাত্রিক বিচার-বিশ্লেষণও করে।

অমিয়ভূষণের *মধু সাধুখাঁ* (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৬৮, গ্রন্থাকারে ১৯৮৮) নামের ক্ষুদ্র উপন্যাসে এসব উপাদান প্রত্যক্ষত অনুপস্থিত। কিন্তু অনুসন্ধানের স্তর যদি এক পরত গভীরে প্রসারিত করা যায় তাহলে পাওয়া যাবে অসংখ্য আকর উপাদান, উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব যেগুলোর সুলুক-সন্ধানকে নিজের আরাধ্য মনে করে। প্রথমেই চোখে পড়বে ভাষিক নিরীক্ষা। উপনিবেশিত বাংলা ভাষার আকার-প্রকারকে যথাসম্ভব শমিত করে উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার এক জীবনচিত্র উন্মোচনে লেখকের সাবধানী অভিনিবেশ নজরে পড়বে। সামনে চলে আসবে এমন এক ভূগোল এবং পথ-

পরিক্রমা, উপনিবেশের প্রত্যক্ষ তাঁবে গড়ে ওঠা ভূগোল আর যোগাযোগের সাথে যার কোনো মিল নাই। উৎপাদন, বিপনন কিংবা জীবনযাপনের 'ভালো' পদ্ধতি সম্পর্কে উপনিবেশ-আমলে আমাদের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, আর সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অসংখ্য রচনায় সেগুলো পুনরুৎপাদিত হয়ে হয়ে যেভাবে 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠেছে, দেখা যাবে, *মধু সাধুখাঁ* সেগুলোর আকার-প্রকারকে এড়িয়ে গিয়ে সম্ভাব্য বিকল্প প্রস্তাব করতে পেরেছে। সে প্রস্তাব এমনকি সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা বা 'বিদেশি' তথা 'পশ্চিমা'দের সাথে যোগাযোগের প্রক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে সম্ভবত আবির্ভূত হবে মনের স্বাস্থ্য। উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব মনের উপনিবেশায়নকে সঙ্গত কারণেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাহিত্যে মনের উপনিবেশায়ন ধরা পড়ে চরিত্র বা ধারণা বা মূল্যবোধের উপস্থাপনায়। রচয়িতা হয়ত নিজেকে এবং নিজের চারপাশকেই চিত্রিত-চিহ্নিত করছে। হয়ত সহানুভূতি বা বিশ্বস্ততারও ঘাটতি নাই। কিন্তু যে চোখ দিয়ে তিনি দেখছেন, যেভাবে চিত্রিত-চিহ্নিত করছেন, তাতেই উপনিবেশিত মনের তুরীয় প্রতাপ। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বরাশি বিশেষভাবে এই মনের হদিশ নিতে চায়। ভাঁজ খুলে দেখাতে চায় আধিপত্যসূচক মতাদর্শিক নির্মিতির উৎসগুলোকে। এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নেয়া সম্ভব হয়েছে গত কয়েক দশকে ব্যাপকভাবে চর্চিত-বিকশিত কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্বের আনুকূল্যে। উত্তর-আধুনিক চর্চার ফসল থেকে সহজেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া গেছে যে, পশ্চিমা আধুনিকতা আসলে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার সহোদর ও সহযোগী; আর উপনিবেশিতের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া কার্যত উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়াই বটে। চিহ্নতত্ত্ব এবং উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যিক কলাকৌশল টেক্সট-বিশ্লেষণের কার্যকর সব প্রণালি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো যে কোনো রচনার প্রভাবশালী পাঠের বিপরীতে কার্যকর বিকল্প তৈরি করতে পারে। সংস্কৃতি-অধ্যয়ন শাস্ত্র সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক উপাদানগুলোকে মনের গড়ন ও সক্রিয়তার নিয়ামক হিসাবে ব্যাখ্যা করতে শিখিয়েছে। এসব উপাদানের সহায়তায় পাঠ করলে বোঝা যায়, বাংলাভাষীদের উপনিবেশিত মনকে সচেতনভাবে পরিহার করে অমিয়ভূষণ যেতে চেয়েছেন কয়েকশ বছর আগের উপনিবেশ-পূর্ব পাটাতনে। এঁকেছেন বি-উপনিবেশিত মন ও প্রতিবেশ। জাতীয়তাবাদী বা উপনিবেশ-বিরোধী আদর্শবাদের ফাঁদও তাঁকে বিচলিত করেনি।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব ও *মধু সাধুখাঁর* একত্র-পাঠ একটি পারস্পরিক পাঠ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

২

কেমন ছিল উপনিবেশ-পূর্ব বাংলা? *মধু সাধুখাঁর* পত্তনে এ প্রশ্ন অমিয়ভূষণের প্রস্তাবে ছিল বলে টেক্সটে এন্তার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এক জায়গায় পাচ্ছি এরূপ বিবরণী : 'প্রবন্ধে দোষ না-থাকায় বলি, জন হকিন্‌সের চেষ্টায় খাশ আংলিশ দেশে এ-রকম

সময়েই ব্রড্‌সাইডের পরিকল্পনা গ'ড়ে উঠছে, পরে ইস্পোনি হার্মাদার বিরুদ্ধে যা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল' (অমিয়ভূষণ, ১৯৮৮ : ১৭-১৮; এরপর এ বইয়ের ক্ষেত্রে শুধু পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হয়েছে)। অন্যত্র উপন্যাসের সীমা লঙ্ঘন করে লেখক কৈফিয়তসহ ঢুকে পড়েছেন ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তসমেত :

> প্রিয় পাঠিকা, এখানে একটা কথা বলা দরকার। বুঝতে পারছি ঘটনাটা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের। এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ নিজেই। ইতিহাসের চরিত্রই বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভবপর হচ্ছে না। যথেষ্ট উপাদান পাই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলা যায়। অসুবিধা এই যে তাদের সম্বন্ধে গল্প লিখলে সত্য গোপন করতে হবে কেননা সত্যই অবিশ্বাস্য। যা হোক, যেমত পারি বলি। (পৃ. ১০)

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উপন্যাসের বদলে নিজের রচনাকে প্রবন্ধের সুবিধা দিতে চাচ্ছেন লেখক, যাতে করে বানোয়াট গল্পের বদলে 'ঐতিহাসিক সত্যে'র ইশারাটা মজবুত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতির দাবি আরো স্পষ্ট। বলা হচ্ছে, পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি উপন্যাস লিখতে পারছেন না; কারণ সত্যই সেখানে গল্পের চেয়েও অবিশ্বাস্য। কেন? অনুমান করতে বাধা নেই — এবং সেই অনুমানের ভিত্তি খোদ উপন্যাসটিতেই মজুত আছে — উপনিবেশ আমলের পর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা পুরনো বাংলার দিকে যেভাবে তাকাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তার সাপেক্ষে ওই আবিষ্কৃত সত্য গল্পের অধিক গল্প বলেই মনে হবে। উপরিউক্ত প্রথম উল্লেখে নৌকার পাশ থেকে তোপ দাগানোর পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। ফিরিঙ্গি ফিচের হাজিরায় এবং অংশগ্রহণে পরীক্ষাটা করেছে স্বয়ং মধু। আর লেখক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, খোদ ইংল্যান্ডেই সমধর্মী পরীক্ষা সমসময়েই হয়েছিল। এসব বিচিত্র উল্লেখ যে উপনিবেশকালকে অভিজ্ঞতার বিভাজক হিসাবে মনে রেখেছে তার এক প্রমাণ সেকালের সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখ : 'গোটা পৃথিবী নাকি দু-ভাগে ভাগ করা : এক ভাগে পর্তুগিজ, আরটি ইস্পেনি হার্মাদদের। এদের, অর্থাৎ আংলিশদের, ভাগে নবডংকা।' (পৃ. ১৭) এ সংবাদ শুনে মধু ঠাট্টা করতে ছাড়ছে না : 'মাইরি, বলা, আমাদেরকে একদম ভাবলো না তোমরার ফাদার পোপা।' বোঝাই যাচ্ছে, মধু 'আংলিশ'দের মাপেই নিজেদের ভাবছে। এরকম সম-পরিস্থিতিতেই তুলনা চলতে পারে। *মধু সাধুখাঁ* তার ক্ষুদ্র কায়ার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছে সেই তুলনায়। তাতে বাংলা অঞ্চলের যে ছবি ফুটেছে, তা আর যাই হোক, উপনিবেশিতের হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত নয়।

২.১

'১৫৮৬ সালে'র ওই বাংলায় প্রথমেই চোখে পড়বে নদীকেন্দ্রিক বাংলা অঞ্চলের এক ভিন্ন ভূগোল এবং মানচিত্র। ব্রিটিশ শাসনে রূপায়িত ভূগোল কিংবা জাতীয়তাবাদী জোশে কল্পিত ভূগোল থেকে স্বতন্ত্র সে এক প্রাকৃতিক সীমানা। রেলপথ ও সড়কের সঙ্গমে গড়ে ওঠা নগর তার কেন্দ্র নয়। কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের চোখ দিয়ে অঙ্কিত

অস্তিত্বও নয়। বরং নদীর প্রবহমানতার মধ্যে, আক্ষরিক অর্থেই জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নদীর তীরবর্তী বর্ণাঢ্য হাটবাজার-বসতি-নগর-রাজ্য নিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে এক দেশ, যার শাসক তখন তিনজন। তিন শাসকের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। মধু বারবার ফিচ ওরফে বলাইকে বলেছে, তাদের এক রাজা, নারী হলেও এক রাজাই ভালো। এখানে, এই বাংলায়, তিন শাসকের সীমানা আর রদবদল মধুর মতো ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্যার কারণ হচ্ছে। নদীপথে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কোথাও কোথাও বেশ শিথিল। আবার কোথাও ঠিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, কোন রাজার সীমানা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ। সব মিলিয়ে নদী থেকে দেখা এ এক অন্যরকম দেশ। সেকালের বোধবোধির সম্ভাব্য ছক ব্যবহার করে, উপনিবেশ-পরবর্তী ছাঁচকে যথাসম্ভব এড়িয়ে উপস্থাপিত হয়েছে ওই ভূগোল আর মানচিত্র।

২.২

মধু সাধুখাঁর দেশ মোটেই 'সকল দেশের রানি' নয়, কিন্তু জীবনযাপনগত এবং বস্তুগত ঐশ্বর্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ধনী। ধূমপানের খুব বাহারি আয়োজনের বিবরণ পাই এখানে। বহুবিচিত্র, মার্জিত এবং শৌখিন। মধু যেসব পণ্যের কারবার করে তাতেও দেখছি বিলাসের ছোঁয়া : চুয়াচন্দন, এলাইচি-লবঙ্গ, শান্তিপুরী শাঁখের চুড়ি, কস্তুরী, পোস্তদানা, যষ্টিমধু, এন্ডি, ভোটকম্বল, সন্তরা, আমলকী। (পৃ. ১৪) অন্যত্র, হরিণের মাংশ খাওয়ার যে বিবরণ আছে (পৃ. ৩১), তাতে জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে : 'নুন মশলার অভাব কী বেনের নায়ে? ঝলশানো মাংস থেকে চর্বি গড়িয়ে যাচ্ছে, ভাজা জিরা আর ছ্যাঁচা গোলমরিচের ঘ্রাণ ভাসছে।' ইত্যাদি।

পুরনো বাংলার এ বিবরণী ইতিহাস-সমর্থিত। উপনিবেশ আমলে অন্যরকম ভাষ্য জনপ্রিয় হয়েছিল। বলা উচিত, জনপ্রিয় করা হয়েছিল। উপনিবেশিতদের সুবিধামত চিহ্নিত-চিত্রিত করা এবং নিজেদের উঁচু আর অন্যকে কোনো-না-কোনোভাবে অধস্তন হিসাবে প্রতীয়মান করা একটি কার্যকর ঔপনিবেশিক কৌশল। আনিয়া লুম্বা (Loomba 2001: 109) এর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন। বহু বছর ধরে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন স্যার টমাস রো। এক পত্রে তিনি তাঁর নিয়োগদাতাকে জানিয়েছেন, 'যে উপহারসামগ্রী আমরা নিয়ে আসি, দরবারের লোকজন তা নিয়ে হাসাহাসি করে। এখানে উৎকৃষ্ট কাপড় বা উন্নতমানের চিত্রকর্মের ছড়াছড়ি। আমাদের দেওয়া জিনিসগুলোকে এরা তুচ্ছ জ্ঞান করে'। পরে কিন্তু আগের সে অবস্থাকেই ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। প্রাচ্য, বিশেষত ইসলামি দুনিয়ার ঐশ্বর্য, স্বৈরতন্ত্র ও ক্ষমতার প্রতাপকে বিপরীত ধরনের বর্বরতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় — সভ্যতার অভাবরূপে নয়, বাড়াবাড়িরূপে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেমন আদিমতার কথা বলা হয়েছে, এখানকার ক্ষেত্রে তেমনি বলা হয়েছে সভ্যতার বিকার ও ক্ষয়ের কথা।

ভারতীয়দের 'বর্বর' আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দেওয়া খুব সহজ ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনেই ভারতীয় 'অপর' নির্মাণ আবশ্যক। আশিস নন্দী (Nandy, 1989 : 17-18) লিখেছেন, দুই পরস্পরবিরোধী যুক্তিধারায় তারা এই সমস্যার একটা বিহিত করার চেষ্টা করে। এক. ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তারা ছেদ তৈরি করে। যুক্তিটা দাঁড়ায় এরকম: সভ্য ভারত সুদূর অতীতের ব্যাপার; বর্তমানের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। দুই. ভারতীয় সভ্যতায় কিছু ভালো জিনিস ছিল বটে, কিন্তু তাতে তার ধ্বংসের বীজও ছিল। প্রথম যুক্তির 'ছেদে'র বিপরীতে দ্বিতীয় যুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকতাকে, যদিও তা মন্দের — ভালোর ধারাবাহিকতা নয়। ফলে ভারতের বর্তমান বেহাল দশার জন্য ঔপনিবেশিক শাসন দায়ী তো নয়ই, বরং এই শাসনই মুমূর্ষু ভারতকে বাঁচিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।

মধু সাধুখাঁর অমিয়ভূষণ সচেতন বা অচেতনভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবেলা করেছেন বলেই মনে হয়। তাঁর উপস্থাপিত জীবনযাপনের মধ্যে বিলাস আছে, কিন্তু সেই বিলাসিতায় ক্লেদ বা গ্লানি নাই, থাকার কোনো কারণও নাই। বরং দেখাই যাচ্ছে, পেশাগত নৈপুণ্য আর প্রযুক্তিতে এ জনগোষ্ঠী যথেষ্ট স্বাবলম্বী। তার ছাপাখানা নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান আছে। আছে নদী ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। মধু তো বটেই এমনকি গন্না মাঝিও প্রয়োজনীয় জ্ঞানে ধনী। সবচেয়ে বড় কথা, ফিরিঙ্গি বা ইউরোপীয় সভ্যতার কোনো কোনো গুণের উল্লেখ থাকলেও এমন ভাবার অবকাশ নাই যে পতিত বাংলাকে উদ্ধার করবে ইউরোপীয়রা। বস্তুত 'পতিত বাংলা' এক ঔপনিবেশিক মিথ।

২.৩

মধু সাধুখাঁ উপন্যাসের ভাষা-নিরীক্ষা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। দুই দিক থেকে। একদিকে বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান এবং ব্যবহারিক সচলতা সম্পর্কে পাচ্ছি বেশ কিছু বিবরণ; অন্যদিকে ওইকালের বাস্তবতাকে ধরার প্রয়োজনে খোদ উপন্যাসের ভাষায় লেখক চালিয়েছেন কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভাষাপরিস্থিতি এবং বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান আসলে জীবনযাপনগত সচলতার ফল। সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী ধারণা হল, ইংরেজ-আমল পূর্ব বাংলায় রক্ষণশীলতা ছিল অতি ব্যাপক, আর জীবনের জঙ্গমতা ছিল অচেনা। সাম্প্রতিক গবেষণায় এ ধারণা শুধু ভুলই প্রমাণিত হয়নি, বরং উল্টো প্রতীয়মান হয়েছে। নতুন ধারার ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, ভারতের পশ্চিমায়ন আর আধুনিকায়ন তো দূরের কথা, উনিশ শতকে ব্রিটিশরা বরং কৃষক ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের এক ঐতিহ্যিক ভারত আবিষ্কার করে, এবং তাকেই রূপায়িত করে (Bose and Jalal, 2002 : 77)। আঠারো শতকে গ্রামীণ সমাজে যে চলিষ্ণুতা ছিল, তার বিপরীতে ঔপনিবেশিক শাসন তৈরি করে সুবিধাজনক স্থিতিশীল গ্রামসমাজ। ঔপনিবেশিক শাসন ও এর

আর্থিকনীতির ফলে শহর-গ্রামের ফারাক বেড়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধিকতর হারে বঞ্চিত হয়েছিল (সিরাজুল, ২০০২ : ১৫৫)। তাছাড়া কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো বড় নগর গড়ে উঠলেও সামগ্রিকভাবে নগরায়ণের হার বাড়েনি (ইরফান, ১৯৯৯ : ৬২; সব্যসাচী, ১৩৯৬ : ১২১)। সামাজিক স্থিতিশীলতার অংশ হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসন সমাজের বর্ণবিভাজনকে শক্তিশালী করে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের নিশ্চয়তা তৈরি করে, যা তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশপূর্ব যুগে থাকলেও বাস্তবে প্রায়ই উপেক্ষিত হত (Bose and Jalal, 2002 : 77)।

মধু সাধুখাঁ উপন্যাসে আছে এর প্রায় একশ বছর আগের পরিস্থিতি। ওই পরিস্থিতি উল্লিখিত বিবরণকে প্রায় আক্ষরিকভাবেই সমর্থন করে। মধুর ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'মদু সা অন্যূন চারটে ভাষায় কথা বলে। নিজভাষা রাঢ়ী ছাড়াও সংস্কৃত, গৌড়ের ভাঙা ফারশি, হার্মাদি-মগাই। ইদানীং পঞ্চমের চর্চা চলছে।' (পৃ. ২) এই পঞ্চমটি ইংরেজি। ফারসি ও পর্তুগিজের মতো কেজো ভাষার সাথে যুক্ত হয়েছে অভিজাত সংস্কৃত। কিন্তু মধুর ভাষাকে ওই সংস্কৃত 'পরিশুদ্ধ' করে জাতে তুলতে চায়নি, যেমনটা দেখা গেছে উপনিবেশিত বাংলায়। ঔপনিবেশিক শক্তি হীন 'অপর' প্রণয়নের অংশ হিসাবে আক্রমণ করেছিল চালু বাংলাকে। প্রচার করেছিল এমন তথ্য যে বাঙালির বাংলা অশুদ্ধ এবং বাঙালি বাংলা জানে না (Halhed, 1980)। মধুর ভাষাচর্চায় কিন্তু এ ধরনের কোনো হীনম্মন্যতা ছিল না। যবন-সংশ্রব এড়ানোর কোনো চেষ্টা সেখানে দেখা যায় না। ঠিক এখানেই *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের ভাষাপরিস্থিতি বিশেষভাবে ওই কালের ভাববিগ্রহ এবং গভীর বাস্তবতার সাথে যুক্ত, কারণ, ওই ভাষা গভীর স্তরে — উপরিস্তরে তো বটেই – জীবনের সচলতা ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ, ধর্মীয় ও সংস্কারগত ঔদার্যের প্রত্যক্ষ ফল; উপনিবেশ-পরবর্তী ভাষাদর্শন যেভাবে 'শুদ্ধতা' ও 'পবিত্রতা'র ডিসকোর্সে আক্রান্ত হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মধু সাধুখাঁর ভাষা-ডিসকোর্স খুব সচেতনভাবে উপনিবেশিত বাংলার এসব অনুষঙ্গকে সামনে নিয়ে এসেছে বলেই মনে হয়। ফিরিঙ্গি ফিচের সাথে বাংলা পয়ার আর গদ্য-সম্পর্কিত কথোপকথন তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ফিরিঙ্গি বলেছিল, মধুর দেশে পয়ার ছাড়া কিছু হয় না : 'ফিরিঙ্গি বলে পয়ার ছাড়া লাচার'। (পৃ. ৩০) মধু সুযোগটা নিতে ছাড়ে না। বলে : 'তা লাচারও তো ছন্দ'। এরপর মধু যে প্রসঙ্গ তোলে তা উপনিবেশ-পরবর্তী বাংলা গদ্যের বিতর্কের মতোই শোনায়। পুরনো বাংলায় গদ্য ছিল না কেন — এ প্রশ্নের জবাব নানাজন নানাভাবে খুঁজেছেন। পুরনো গদ্যের নানা নমুনা পাওয়ার পরও বিপুল অধিকাংশ গবেষক ধরে নিয়েছেন, 'আধুনিক' কালের আগে এদেশে গদ্য ছিল না। কারণ, 'যে-তত্ত্বজ্ঞান ও যুক্তিবোধ, যে-পরিশীলন ও মননশীলতা থাকলে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবের আগে আমাদের দেশে তার বিকাশ হওয়া সম্ভবপর ছিল না' (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৪ : ১৫)। মধু কিন্তু তুলেছিল মোক্ষম প্রশ্নটি : 'কানা শিরোমণির লব্য ল্যায়ের টিকা-টিপ্পনী — সে কি বাপু পয়ার? না কি মনুর জয়মঙ্গলা?' (পৃ. ৩০) বোঝাই যাচ্ছে, অমিয়ভূষণ কার্যত উপনিবেশ আমলে রূপায়িত বাংলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তুলেছেন এমন এক মানুষের মারফত, যে বিদ্যাচর্চা করে এবং করার মতো অর্থ ও সময় খরচের সামর্থ্য তার আছে। শুধু তাই নয়, যার ধর্মালোচনা প্রায়শই যায় ধর্মতত্ত্বের দিকে, এবং আরো এগিয়ে যেতে চায় দর্শন অবধি।

বস্তুত মধুর সামগ্রিক যাপনপদ্ধতিতে একটা বহুজাতিক-বহুভাষিক সচলতা ছিল। তার ঘরেই ছিল 'বিবিসাহেব', নৌকায় ছিল বদর। ফিরিঙ্গি ফিচকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সে। এসবই সেকালের স্বাভাবিক চিত্র। এ পরিস্থিতিতে ভাষার মধ্যে জীবনযাপনগত যে বৈচিত্র্য সঞ্চিত হওয়ার কথা, মধুর ভাব-ভাষায় তাই ছিল। উপনিবেশকালের প্রমিত বাংলার বাইরে গিয়ে পুরনো মূর্তিতে *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের যে ভাষাভঙ্গি অমিয়ভূষণ তৈরি করতে চেয়েছেন তার গভীর তাৎপর্য এখানেই। বাহ্যত শব্দাবলির বিশিষ্ট ও 'বিকৃত' রূপ ব্যবহার করে তিনি একটা প্রাচীন গন্ধ নিয়ে আসতে চেয়েছেন। সেটা ভালো হল কি মন্দ, সফল কি বিফল, সে প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। উপনিবেশকালে উত্থিত অনেকগুলো প্রশ্ন লেখক আমলে এনেছেন, বর্তমান প্রসঙ্গে সেটাই মূল কথা।

২.৪

এ উপন্যাসে উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার আর যে বিশিষ্টতা পরবর্তী বাংলার প্রচারিত-প্রচলিত বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা বলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল নর-নারী সম্পর্ক, বিশেষত ওই সম্পর্কের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিক যৌনতা। উপন্যাসটি বেশ পুরুষতান্ত্রিক। একটি প্রকট পুরুষপ্রধান সমাজ ও সময়ের ততোধিক পুরুষপ্রধান এলাকার চিত্রায়ণের জন্য যতটা পুরুষতন্ত্র দরকার হয়, সম্ভবত তারচেয়ে বেশি পুরুষতান্ত্রিক। ফলে 'পুরুষ জীয়ে না' বলে মধুর আক্ষেপ একটু বাঁকা পথেও ঘরে গিয়ে পৌঁছায় না। নদী ছেড়ে মধু বেশ কতকটা সময় ডাঙায় থাকলেও এবং সেখানে শ্বেতাঙ্গ ফিচকে কেন্দ্র করে 'নারীর বাজারের' একটা ইশারা পাওয়া গেলেও, মধুর ঘরের খবর বিশেষ পাওয়া যায় না। ফলে নর-নারীর বৈবাহিক বা প্রেম-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 'আধুনিক' জমানায় সংসারচরিত রচনার যে প্রচলন তার সাথে *মধু সাধুখাঁর* জগৎ মোটেই মিলবে না। এক অর্থে একে লেখকের নিরাসক্তিই বলা যেতে পারে। এমনকি আরেকটু উজিয়ে গিয়ে বলা যায়, 'উপন্যাস' লিখতে চান না বলেই সংসারকে দেখার বর্তমানে প্রতাপশালী ওই কাঠামোকে এড়িয়ে তিনি পুরনো বাংলাকে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গে কালক্ষেপণ না করে যেতে চাই যৌনতার দিকে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী *বাঙালী জীবনে রমণী* (১৪০৮) বইতে উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক নতুন বাঙালির প্রেমচেতনার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রধানত ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজ সংস্কৃতি থেকে নব-উদ্ভূত বাঙালি

শিক্ষিতসমাজ পুরনো স্থূল কামের বদলে আয় করেছিল এক মার্জিত প্রেমদৃষ্টি যার স্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্যে। নীরদ এ বাবদ প্রকৃতির ভূমিকাও বিশদ করেছেন। দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের আগে প্রকৃতিকে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য করে তোলার কোনো ইতিহাস — অন্তত আধুনিক কালের রোমান্টিক অর্থে — বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। তাঁর শনাক্তি সম্ভবত যথার্থ। *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে প্রধানত মধুর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিতে অবগাহনের কয়েক কিস্তি বিবরণী আছে। পুরনো বাংলা সাহিত্যকে নজির ধরে বলা যায়, এই চোখ বর্তমান কালের লেখকের। নদী ও বনানীর ওই মোক্ষম ক্ষেত্র থেকে নিজেকে বিরত রাখা হয়ত যে কোনো লেখকের জন্য দুরূহ। নীরদ চৌধুরী অবশ্য উনিশ শতকের প্রেমের বিপরীতে পুরনো কামের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কেবল স্থূলতাই দেখেছেন। খেয়াল করেননি যে, যে চোখ দিয়ে তিনি বিচারটা করছেন এবং যে চোখ দিয়ে খোদ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন তা ভিক্টোরীয় দৃষ্টিভঙ্গি — ইংরেজি সাহিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজে সওয়ার হয়ে উড়ে এসেছে কলকাতার নতুন সমাজে। হয়ত ভালোই হয়েছে। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গিরও বিস্তর সমালোচনা — এবং সীমাবদ্ধতা — দুনিয়াজুড়ে জাহির আছে। বিপরীতে অমিয়ভূষণ স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার বিচারে না গিয়ে বিচিত্র যৌনতার এক স্বাভাবিক প্রবাহ এঁকেছেন, যাকে আজকালকার নানামাত্রিক নতুন বিচারে 'স্বাস্থ্যকর' বলেই হয়ত সাব্যস্ত করা যাবে।

মধুর দুই পরিবার। প্রথম স্ত্রীর এক ছেলে তিন মেয়ে। কিন্তু 'শাস্ত্রে বলে একপুত্রক অপুত্রকের শামিল'। কাজেই বিরক্ত হয়ে সে দ্বিতীয়াকে ঘরে এনেছে। এর বাইরে প্রয়াত খুড়ার রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে পেয়েছে 'বিবিসাহেব'কে, যে কিনা 'একটু বেশি ফুটে যাওয়া সফেদগুল'। নৌকায় গত চার বছর ধরে তার সাথে আছে খোজা ক্রীতদাস বদর। এই পরিসংখ্যান বহু ও বিচিত্রগামী এক মধুর কথা বলে। কিন্তু এর মধ্যে বিকারের কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠেনি। আবার অন্য আলাপও আছে, যেখানে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাই অন্য এক নতুন মাত্রায় চলে যাবে। মধু ছেলের বিয়ে দিয়েছে সতের বছর বয়সে। 'বেটাবউও সুলক্ষণা। ফুলের মতো মেয়ে, কিন্তু এখনই পাছা ভার হচ্ছে না কেমন।' (পৃ. ৬৭) মূল প্রসঙ্গ যেখানে প্রজনন এবং সেই প্রজনন এই স্বল্পায়ু পুরুষের দেশে জীবনের অস্তিত্বের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই আলাপে স্থূলতার খোঁজ অর্থহীনই বটে।

৩

উপনিবেশের সম্পদের উপর দখল কায়েম করাই উপনিবেশায়নের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক বিবেচনায় উপনিবেশায়নের সামান্যই বোঝা যাবে। যেতে হবে মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের দিকে। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো এ দুয়ের — অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের — সম্পর্ক বিশদ করেছেন :

> Its most important area of domination was the mental universe of the colonized, the control, through culture, of how people perceived themselves and their relationship to the world. Economic and political control can never be complete or effective without mental control. To control a people's culture is to control their tools of self-definition in relationship to others. (Thiong'o, 2007 : 16)

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজে এই আধিপত্য পূর্ণরূপে কায়েম হয়েছিল। ফলে 'আপন-পর' আর 'ভালো-মন্দে'র ছক গিয়েছিল উলটে। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর মতে, এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ স্থানীয় সংস্কৃতির অবনয়ন। *Black Skin White Masks*-এর ফানোর কথা ধার করে একে বলা যায় 'an inferiority complex … created by the death and burial of its local cultural originality.' (Fanon, 1968 : 18)

দেবেশ রায় (১৯৯০ : ৮৫) পত্রপত্রিকা বিশেষত *সমাচার দর্পণ* থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির আরেক ধরনের অবনয়নের খবর দিয়েছেন। *দর্পণে*র প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ববিস্তারের সংবাদ-কাহিনি, ইউরোপ-ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সংবাদ, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ। এভাবে নাগরিক বাঙালির কাছে বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত *দর্পণে*র মতো করে তৈরি হতে থাকে। এই পত্রিকায় বাঙালি সমাজের খবর হিসাবে প্রাধান্য পাচ্ছিল — বৃদ্ধের বহুবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ, ঘটকের কারসাজি, বিবাহের উছিলায় প্রবঞ্চনা, পুরোহিতদের কীর্তিকাহিনি, দেশীয় কবিরাজদের চিকিৎসা-বিভ্রাট ইত্যাদি। প্রায়শই ছাপা হয়েছে 'sketches and articles on local superstitions and inconsistencies in social behaviour' (Kamal, 1977 : 25)। প্রভাবশালী 'জ্ঞান-উৎস'গুলোতে দীর্ঘদিন এ ধরনের প্রচারণা চলার পর উপনিবেশিতের উচ্চারণ এরকমই হওয়ার কথা :

> আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেকদিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। (রাজনারায়ণ, ১৪০২ : ৩৩৩)

ভারতবর্ষীয়রা হীন, তাই পরশাসন তাদের জন্য অনিবার্য — এই বোধ কলকাতার ভদ্রলোকদের মনে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জেঁকে বসে গেছে। এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসন কতটা সহজ হয়ে গেছে তার প্রমাণ মেলে ইংল্যান্ডে সম্পদপাচার বিষয়ে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার অবস্থানে: 'The Hindu Patriot looked upon this annual payment as India's tribute to England for the blessings of civilized rule.' (Chandra, 1975 : 116) অস্ত্রের জোরে এই সম্মতি আদায়

অসম্ভব। সম্ভব ভাষার জোরে। নগুগি ওয়া থিওঙ্গোর মতে এ হল 'conscious elevation of the language of the colonizer' (Thiong'o, 2007 : 16)। এখানে 'ভাষা' কথাটি ঠিক ইংরেজি-বাংলা অর্থে নয়, ব্যবহৃত হয়েছে আরো গভীর ও ব্যাপক অর্থে। এ আসলে জীবনদৃষ্টি, বা ভাবাদর্শ, বা সংস্কৃতি। দীর্ঘ বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রধানত উপনিবেশের সুবিধাভোগী অংশের মধ্যে কায়েম হয় ঔপনিবেশিক 'হেজিমনি', এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব খুব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁরা এও খেয়াল করেছেন, ইউরোপের যে বাস্তবতায় গ্রামসির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার ফারাক বিস্তর। তবে এটা ঠিক, ঔপনিবেশিক সমাজে দমনপীড়নের পাশাপাশি 'সম্মতি'ও হাত-ধরাধরি করে চলেছে, যে সম্মতি কখনো স্বতঃউৎপাদিত, কখনোবা কৌশলে জাত (Loomba, 2001 : 31)। এর মধ্য দিয়ে — উপনিবেশকের আধিপত্য আর উপনিবেশিতের হীনতার বোধ একত্র হয়ে — গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন ভাষা, যাকে বলা যায় উপনিবেশিত মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতির ভাষা।

উপনিবেশ-পরবর্তী অসম ক্ষমতাসম্পর্কের এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে *মধু সাধুখাঁ* পড়লে ক্ষমতাসম্পর্কের সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিস্থিতি কিভাবে কাজ করে থাকতে পারে, তার পরিকল্পিত নমুনা পাওয়া যাবে।

৩.১

উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই পাই মদু সা-র চেহারার বিবরণ :

> চিকন ঠাণ্ডা কালো রঙ, টিকলো নাক, টানা চোখ, বলে চক্ষু; সে-চোখের প্রান্তগুলি আবার লাল; দাঁতগুলি সুগঠিত, কিন্তু কষ ঘণ্টায়-ঘণ্টায় পানরসে লাল; চলেও যেন সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি। ... লক্ষ করলে দেখা যায় টিকলো নাকের উপরে চুলের মতো সূক্ষ্ম ক'রে টানা রসকলি। (পৃ. ১)

ইংরেজ আমলে বা পরে বাংলা সাহিত্যে ইতিবাচক অর্থে নায়ক চরিত্রের এরকম বর্ণনা অভাবনীয়। কারণ তদ্দিনে পুরুষের শারীরিক সৌন্দর্য অথবা পৌরুষ সম্পর্কে ধারণা গেছে বদলে। কিন্তু কেবল মধুখাঁর বিবরণীতেই লেখকের এই নির্মাণ সমাপ্ত হয়নি। তিনি বারকয়েক গেছেন ইংরেজ ফিচের দিকে। মধুর চোখ দিয়ে এঁকেছেন ইংরেজ পর্যটকের সুরত : 'মাথায় শাদার আঁশ মেশানো বাদামি চুল। রোদে-জলে লালচে হ'য়ে-ওঠা সফেদ শাদা রঙ। চোখে কী ক'রে দেখতে পায়? আশ্চর্য! আমার তোমার চোখের যেখানে মণিটা সে-রকম জায়গায় ওর চোখে খানিকটা সবজে-কটা রঙের ছোপ।' (পৃ. ১৬) অন্যত্র মধুর চোখে 'আংলিশ' পুরুষটির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে এভাবে : 'এ-লোকগুলো এমন শাদা-শাদা যেন ছায়া-ছায়া, যেন রক্তওলা নয়।' সে এর একটা ব্যাখ্যাও দাঁড় করায় : 'আমারদের পঞ্চভূতের কায়ে মৃত্তিকা থাকে। তোমরার কায় মৃত্তিকা ছাড়া অন্য চারে হয়, যেমত জলজ শেহলা।' (পৃ. ৪৫-৪৬)

এখানে হয়ত এ অভিজ্ঞতার সাথে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারব চিনুয়া আচেবের *থিংস ফল এপার্ট* (১৯৫৮) উপন্যাসের অভিজ্ঞতাকে। সাদা মিশনারিরা আফ্রিকায় নতুন এলে স্থানীয়দের কাছে তাদের মনে হয়েছিল শ্বেতিরোগগ্রস্ত, আর সাদাদের উল্টাসিধা কায়কারবার দেখে পরিহাসছলে তারা ভাবত, এরা বোধ হয় সন্তান জন্মদানের জন্য স্ত্রীকে উপরে রেখে সঙ্গম করে। মধুর ভাবনার সাথে অবশ্য আচেবে-বর্ণিত ওই অভিজ্ঞতার একটা গোড়ার ফারাক আছে। আচেবের মানুষেরা একটা দূরবর্তী অপরিচয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মধু স্বয়ং আশ্রয়দাতা। ফিচ মধুর ভাব-বিনিময়ের পাত্র। ফলে তার সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা অব্যবহিত প্রত্যক্ষতা আছে। আছে সমমূল্যের দুই অস্তিত্বের মধ্যে তুলনার ভঙ্গি। সেই তুলনায় পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক আমলের অভিজ্ঞতা বিপরীতক্রমে কাজ করেছে বলেই *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে প্রমাণ মেলে। ধর্মতত্ত্বের পুনরাবৃত্ত তুলনা পরোক্ষ প্রমাণের উদাহরণ। আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই ফিরিঙ্গি ফিচকে গোসল করানোর ঘটনায়। পরবর্তীকালীন এক বিবরণীর উপস্থিতিতে ঘটনাটা বেশ কৌতুককর হয়ে উঠেছে।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর *আত্মচরিতে* ডেভিড হেয়ারের কৃতিত্ব বর্ণনা করে লিখেছেন (১৯৬১ : ৮) :

> বাঙ্গালীরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বাহির হইত তাহা হইলে তাহাকে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন।

এই বিবরণীর সাথে অমিয়ভূষণের পরিচয় ছিল কি না বলা মুশকিল। কিন্তু *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে পাই এর সম্ভাব্য বিপরীত চিত্র, ঔপনিবেশিক সম্পর্কের কোনোরূপ ভার বহন না করেই যা সম্ভবপর হয়েছিল। মধুর সাথে ফিরিঙ্গির প্রথম দেখা হওয়ার কালে তার গায়ে ছিল 'লাউস্' — উক্কুন। তারপর : 'হো-হো ক'রে হেসে উঠে ছিল মদু সা। নাম জলে। গা ঘশো গঙ্গার মাটি তুলে। বলাকে জোর ক'রে গঙ্গায় নামিয়েছিল দুই মাল্লা, সেই নবদ্বীপের গঙ্গায়।' (পৃ. ২) এরপর সংবাদ পাই : 'মদুর পাল্লায় প'ড়ে ওকে এখন স্নান করতে হচ্ছে।' (পৃ. ১৬) পরে এদিক থেকে এক পরিবর্তিত ফিচকে দেখতে পাই আমরা : 'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ফিরিঙ্গি। এখন ফিরিঙ্গিকে ভদ্রলোক ব'লে মনে হয় না? প্রায় বন্ধু বলতে পারো।' (পৃ. ৪৮)

মধুর এই উদ্যোগকেও এক সভ্যকরণ প্রকল্পই বলতে পারি। উপনিবেশক শক্তি দুনিয়াজুড়ে যে 'সিভিলাইজিং মিশন' চালিয়েছিল প্রায় তার অনুরূপ। পার্থক্য এই যে উপনিবেশের অসম ক্ষমতাসম্পর্কের মধ্যে এ ধরনের কার্যক্রম যে হীনম্মন্যতা তৈরি

করে তা থেকে মধুর কার্যক্রম সম্পূর্ণ মুক্ত। মধু-ফিচ সম্পর্কে ক্ষমতা ও শোষণের চাপ নেই, আছে পারস্পরিকতা।

৩.২

মধু সাধুখাঁ যে ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সগুলোর কোনো কোনোটিকে সচেতনভাবে উপনিবেশ-পূর্ব বাস্তবতায় পরীক্ষা করেছে সতীদাহ প্রসঙ্গ তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করছে। প্রসঙ্গটি এ উপন্যাসে ঘটনা আকারে আছে, মধুর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আকারে আছে, আরো আছে সমাজতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা হিসাবে।

ধীমান দাশগুপ্ত (১৯৮৮) দেখিয়েছেন, সতীদাহের দৃশ্যটি এ উপন্যাসের একটি চাবিদৃশ্য, যা থেকে খোদ উপন্যাসের শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। তিনি প্রসঙ্গত ত্রৈলোক্যনাথের সতীদাহ-বিবরণী এনেছেন, যেখানে, তাঁর মতে, 'বিশ্বাসীর ভূমিকা' এবং 'এই সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি ... সমর্থন' প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই কমলকুমার মজুমদারও উদ্ধৃত হয়েছেন, যেখানে, ধীমান জানাচ্ছেন, সতীদাহের প্রতি লেখকের 'সমর্থন না থাকলেও অন্তত সক্রিয় বিরোধিতা নেই'। কিন্তু ধীমানের মতে, অমিয়ভূষণের দৃশ্যকল্পময় বিবরণীতে 'সতীকে গ্ল্যামারাইজ করার চেষ্টা নেই', বরং নানাভাবে বীভৎসতার ছবিই ফুটেছে।

সতীদাহ প্রসঙ্গ উপনিবেশিত বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যার সাথে উপনিবেশায়নের ন্যায্যতার মতো গুরুতর ব্যাপার জড়িত। সে কারণেই এ আলোচনায় ভালো-মন্দ, সমর্থন-অসমর্থনের মতো স্যাঁতসেঁতে এবং উপরিতলের বর্গ অবলম্বন করা যৌক্তিক হবে না। কার্যত যদি কোনোভাবে দেখানো সম্ভব হয় যে, কেউ একজন এ প্রথাকে সমর্থন করছে, তাহলে কোনো আলোচনায় না এনেই তাকে বাতিল করা বৈধ হবে। ত্রৈলোক্যনাথ তো বটেই এমনকি তিনি যদি কমলকুমার হন তাহলেও। পুরো প্রসঙ্গটি এই উত্তর-ঔপনিবেশিক জমানায় তুলতে হবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, আর অমিয়ভূষণ আদতে তাই করেছেন। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সটি একবার দেখে নেয়া দরকার।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পাদে [বেন্টিঙ্কের (১৮২৯) আগে পর্যন্ত] শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা এভাবে বলা যায়: ভারত শাসিত হবে ভারতীয় রীতিনীতিতে (Said 1994: 180), আর শাসকদের রপ্ত করতে হবে এশীয় আচরণ (Kopf, 1969 : 18)। পুরনো কেতায় ভারত-শাসনের ব্যাপারে হেস্টিংসের পক্ষপাত খুবই প্রত্যক্ষ; আর কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩) অনেকগুলো নতুন উদ্যোগ নিলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া যায় 'defensive form' (Stokes, 1959 : 2-3)। উনিশ শতকের গোড়া থেকে এ মনোভাব দ্রুত বদলে যায়। ওই শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রাচ্যবাদীদের হটিয়ে নীতিনির্ধারকের ভূমিকায় উঠে আসে ইঙ্গবাদীরা।

ইংল্যান্ডের হিতবাদী আন্দোলন এই বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রধানত স্মিথ, বেন্থাম ও মিলের লেখালেখিতে পুরনো মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়, আর ভারতীয় সবকিছু পরিত্যাজ্য গণ্য হতে থাকে। খ্রিস্টীয় মতবাদের ইভান্‌জেলীয় ধারা এই মনোভাবকে জোরালো করেছিল। এরিক স্টোকসের মতে, 'The assumptions of the Evangelical theology and the utilitarian philosophy were remarkably similar.' (Stokes, 1959 : 54) ভারতীয় ধর্ম যে একটা জঞ্জালবিশেষ, এ ব্যাপারে হিতবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মতের অমিল ছিল না (Spear, 2004: 202)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা একদিকে ভারতীয়দের হীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, অন্যদিকে ভারত-শাসনের ব্যাপারে ইংরেজদের করণীয় সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ১৮১৩ সালের চার্টারে এসব প্রস্তাবের একটা অংশ বাস্তবায়িত হয় (Stokes, 1959 : 28-29)। এরপরও চলতে থাকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ধারা, বিশেষত উপযোগবাদীদের সঙ্গে মতাদর্শিক সমন্বয়। নানা মতান্তর ও স্বার্থদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ১৮৩৩-এর আইনে পুরোনো 'প্রাচ্যবাদী'দের বিপরীতে ইঙ্গবাদীরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় আচারের হীনতা, নানা কুসংস্কার এবং সার্বিক অসভ্যতা সম্পর্কে হীতবাদী, ইভান্‌জেলীয় এবং ইঙ্গবাদীদের দীর্ঘদিনের প্রচারণা শাসনক্ষমতার প্রত্যক্ষতায় 'নিরসনে'র সুযোগ তৈরি হয়। ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, কুসংস্কার বা অসভ্যতা কোনো কারণে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এসব প্রচারণা যখন ব্যবহৃত হয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে, যখন উপনিবেশের যুক্তি আকারে উপস্থাপিত হয়ে এগুলো উপনিবেশিতের মধ্যে স্থায়ী হীনতার বোধ তৈরি করতে থাকে, তখন পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। এর চমকপ্রদ উদাহরণ সতীদাহ প্রথা। পশ্চিমারা ভারতীয় সংস্কৃতির শোচনীয়তার উদাহরণ হিসাবে সবসময় এই প্রথার উল্লেখ করেছে। বিপরীতে এর বিলোপ সব পক্ষের কাছেই পশ্চিমা শিক্ষা ও রুচির দান হিসাবে কীর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায় দেখা গেছে, অঙ্কটা আদৌ অত সরল নয়। সতীদাহপ্রথা নিঃসন্দেহে প্রাচীন। কিন্তু তথ্য-উপাত্ত থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, মধ্যযুগেও এর প্রতাপ ছিল কম, দাহের ঘটনা ঘটত অল্প, আর এ প্রথা খুব উঁচুস্তরের কিছু পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। পার্লামেন্টারি পেপার্‌সের বরাতে রজতকান্তি রায় দেখিয়েছেন (Joshi, 1975 : 3-4), পশ্চিমা প্রভাব এ সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে; আর উনিশ শতকের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, অন্য অঞ্চলের তুলনায় ইংরেজদের প্রভাববলয়ে আসা অঞ্চলগুলোতেই সতীদাহের ঘটনা অনেক বেশি ঘটেছে। যেমন বাংলা অঞ্চল বিশেষত কলকাতার আশপাশে এ হার ছিল অতি উচ্চ। ১৮১৫-১৮২৬ সালের মধ্যে বৃহত্তর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে যত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় ৫৭ শতাংশ ঘটেছে কলকাতা ও সন্নিহিত বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া ও চব্বিশ পরগণায়। এর এক গুরুতর কারণ ছিল, এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রতাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে হিন্দুসমাজে ব্যাপকভাবে 'সংস্কৃতায়ন' শুরু হয়, আর নিচু জাতের লোকেরাও সমৃদ্ধ উঁচু-সংস্কৃতি

হিসাবে বহু প্রথা নতুন করে অনুসরণ করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে আশিস নন্দী লিখেছেন :

> It was the babu culture which made a sadistic sport out of sati, and to the extent this culture was itself a product of western and modern encroachments upon the traditional life style, sati was the weirdest response to new cultural inputs and institutional innovations. (Nandy, 1975 : 178)

রজতকান্তি রায়ের সিদ্ধান্ত :

> Paradoxically, the rite of sati, regarded by the British as the most glaring abuse of 'traditional' Hindu society, was in its recrudescent form almost as much a product of colonial penetration as was the movement for its abolition. (Joshi, 1975 : 5)

অমিয়ভূষণের সতী-প্রসঙ্গকে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক থেকে উপরে বর্ণিত মর্জি মোতাবেক প্রায় হুবহু পাঠ করা যায়। প্রথম সতী-প্রসঙ্গ এসেছে মধুর ছোট মায়ের ক্ষেত্রে : 'ছোটোমা পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে একা চিতায় সতী হয়েছিলেন।' (পৃ. ১০) এখানে সামাজিক-ধর্মীয় কোনো চাপের প্রসঙ্গ নাই। এবং আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, মধুর খুড়া মারা যাওয়ার পর তার খুড়িমার সতীদাহ হয়নি। সে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে মধুর সংসারে। মধু তাকে মায়ের অধিক সম্মান করে। এরপর পাচ্ছি নদীতীরের হঠাৎ দেখে ফেলা সতীদাহের বর্ণনা। (পৃ. ১৯) এ বর্ণনায় কিন্তু সতীর নিজের সমর্থনের কোনো পরিচয় নাই। আর ধীমান দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন (১৯৮৮ : ৭৮), 'যারা এ দৃশ্য হঠাৎ দেখে ফেলেছে তারা ভীত ও আতঙ্কিতই, লেখক নিজেও নিতান্ত নিরাসক্ত বর্ণনা না দিয়ে যথেষ্ট শ্লেষাত্মক ভাবে দৃশ্যটি গড়ে তোলেন — যা শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে ... স্পষ্ট।' যদি সতী প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হত তাহলেও আমরা বলতে পারতাম, লেখকের সতীদাহ-সমালোচনাই পুরনোকালের এই উল্লেখের হেতু, মধুর ছোট মা এবং খুড়িমার দুই বিপরীত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও। কিন্তু আসলে এটা শুরু মাত্র, শেষ নয়।

ফিরিঙ্গি ফিচ সতীর ঘটনায় বেশ ভয় পেয়েছিল। সে-ই তুলেছিল তার দেশের ডাইনি-পোড়ানোর কথা। সে অভিজ্ঞতা থেকে মধু সিদ্ধান্ত নেয়, একদেশে নারী পুড়ে হয় 'সতী', আরেক দেশে 'ডান'। ডাইনি-পোড়ানোর আচারের উৎস সম্পর্কে ফিচ মধুকে বলেনি, কিন্তু নিজে তার উৎস তালাশ করেছে। (পৃ. ২০) এর মধ্যে আছে ক্ষমতা-ঘোষণার মওকা এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করার ইতিবৃত্ত। কালবিলম্ব না করে উপন্যাসের পরের পৃষ্ঠাতেই লেখক দাখিল করেছেন সতীদাহ সম্পর্কে মধুখাঁর ভাষ্য : 'আমারদের দেশেতে স্ত্রীজাতি অতিতর বুদ্ধিতা পায়া আছে, কেননা ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কলমধরা, কায়েৎ, আরু মাটিমাখা চাষা ছাড়া কোন পুরুষই বা দীর্ঘকাল জীয়ে? জল, তরবার, তীর দুর্মদরতি নারীর মতো পুরুষের দেহের ও আয়ুর ভাগিদার হয়।'

মধু সাধুখাঁর সতীকাণ্ড, দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো জটিল এবং দরকারি ভূমিকা পালন করেছে। তুলনাসূত্রে ভাবতে বাধ্য করেছে যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এরকম নানা সংস্কার বা অভ্যস্ততা পাওয়া যাবে, যেগুলো খুঁজে-পেতে একত্র করলে ওই জনগোষ্ঠীকে হীন বলে দেখানো সম্ভব। কিন্তু বিবেচনার এই পদ্ধতি ঠিক নয়। কেবল অন্য কোনো হীন মতলবেই কেউ এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারে। ইংল্যান্ড এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রায় একই রকমের এক চর্চা বিকশিত হয়েছিল — এই যুক্তি সাক্ষ্য দেয়, কুসংস্কারেরও ব্যাকরণ আছে। এটা মোটেই ওই কুসংস্কারের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য নয়, বরং এক বা একাধিক কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে পুরো জনগোষ্ঠীকে কলঙ্কিত করার যে প্রভাবশালী ধারা তার বিপরীত প্রস্তাব মাত্র।

৪

উপনিবেশিত সমাজ ও সংস্কৃতি-অধ্যয়নের একটা প্রধান সংকট উপনিবেশ-পূর্ব উপাদানগুলোর সঙ্গে উপনিবেশ-পরবর্তী পরিবর্তিত বাস্তবতার সম্পর্ক নির্ধারণ। কারণ, 'খাঁটি' অতীত বা 'খাঁটি' সংস্কৃতি বলে আসলে কিছু নেই — কোনো কালেই ছিল না। এমন খাঁটিত্ব ছিল না, যা উপনিবেশ আমলে নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে, উপনিবেশ-বিরোধী কোনো প্রতিরোধ-সংগ্রামই — সে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পই হোক আর সাংস্কৃতিক বি-উপনিবেশায়নই হোক — সাম্রাজ্যবাদী ভাবকল্প থেকে মুক্ত থাকে না। এ কারণে তাত্ত্বিকদের অনেকেই উপনিবেশ-পূর্ব অতীত এবং স্থানীয় সংস্কৃতির রোমান্টিক মূর্তি তৈরি করে অতি-প্রশংসার তত্ত্বীয়-ব্যবহারিক বিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন (Loomba, 2001 : 17-18)। *মধু সাধুখাঁ* প্রণয়নকালে অমিয়ভূষণ এ ধরনের বিপত্তি থেকে যথাসম্ভব মুক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। বস্তুত কোনো 'শুদ্ধ' বা 'খাঁটি' অস্তিত্ব — সে বাঙালি বা হিন্দু বা আর কোনো স্থানিক পরিচয় — নির্মাণের ন্যূনতম প্রচেষ্টাও এ উপন্যাসে পাওয়া যায় না। বলা যায়, বিবরণীটি 'সোনার বাংলা' মিথ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং তুলনামূলক বিচারে এ অঞ্চলের কিছু সাধারণ সংকট বা সমস্যার কথাই বারবার বলা হয়েছে। বহু-রাজ্যে বিভক্ত দেশ, যাত্রাপথের বিচিত্র বিপদ-আপদ, ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারকয়েক এসেছে। মধু এমন অনুমান করেছে যে ফিরিঙ্গি ফিচের একরানির শাসনাধীন দেশই হয়ত বণিকের জন্য ভালো। 'আসলে লেখক পুরনো কাল ও প্রাচীন প্রথা নিয়ে লেখার সময়েও অতীতকালে আবিষ্ট হয়ে না পড়ে অতীতের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত করেন ও সেই দৃষ্টি প্রখর ইতিহাসচেতনায় চিহ্নিত হয়ে থাকে।' (ধীমান, ১৯৮৮ : ৭৮) তথ্য এবং বাস্তবতার নিরিখে এটাও বলা যাবে, উপনিবেশক পক্ষ প্রযুক্তির সর্বাঙ্গীণ বিবেচনায় নিশ্চয়ই উপনিবেশিতের তুলনায় এগিয়ে ছিল। আদৌ উপনিবেশ স্থাপন যে সম্ভবপর হয়েছিল, তার কারণ তো এটাই। কিন্তু এগিয়ে থাকাটাই ঔপনিবেশিক নিপীড়নের পক্ষে কোনো প্রকার সাফাই সাক্ষ্য হতে পারে না। মধুর ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মধু আবার জন্মাতে চায় এ দেশেই — 'ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে'।

সেটা হয়ত মানুষের সার্বিক অস্তিত্বের সাথে পারিপার্শ্বিকের গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের এক স্বীকৃতি, উপনিবেশ সর্ব-অর্থেই যে সম্পর্ককে অস্বীকার করেই জায়মান ও কার্যকর হয়। *মধু সাধুখাঁর* প্রণেতা এমন এক চরিত্রের মধ্য দিয়ে এসব নিগূঢ় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটালেন যার চিন্তাময়তা ও দার্শনিকতা সহজাত বৈশিষ্ট্যের মতো আগাগোড়া ক্রিয়াশীল থেকেছে। ফলে আরোপণমূলকতা এই টেক্সটের — শিল্পের জন্য জরুরি — স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করেনি।

যে কোনো টেক্সটই পঠিত হতে পারে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও রীতিপদ্ধতি মোতাবেক। কিন্তু *মধু সাধুখাঁর* নিবিড় পাঠে মনে হয়েছে, ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সগুলোর মোকাবেলা, অন্তত অংশত, এর ঔপন্যাসিক প্রকল্পের অন্তর্গত।

সহায়কপঞ্জি

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৮৮)। *মধু সাধুখাঁ*, বাণীশিল্প, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান (১৯৮৪)। *পুরোনো বাংলা গদ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইরফান হবিব (১৯৯৯)। *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, তৃতীয় মুদ্রণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

কমলকুমার মজুমদার (২০০৯)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, চর্চাপদ, কলকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯০)। *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০০৬)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ধীমান দাশগুপ্ত (১৯৮৮)। 'মধু সাধুখাঁ : একটি দৃশ্যকাব্য', অমিয়ভূষণ ১৯৮৮-তে সংযোজিত, বাণীশিল্প, কলকাতা।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৪০৮)। *বাঙালী জীবনে রমণী*, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫)। *কমলকুমার ও কলকাতা : পিছুটানের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রাজনারায়ণ বসু (১৯৬১)। *আত্মচরিত*, ৪র্থ সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা।

রাজনারায়ণ বসু (১৪০২)। *সে কাল আর এ কাল*, নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৩৯৬)। *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (১৮৫০-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

সিরাজুল ইসলাম (২০০২)। *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ৩য় মুদ্রণ, চয়নিকা, ঢাকা।

Bose, Sugata and Jalal, Ayesha (2002). *Modern South Asia : History, Culture, Political Economy*, 4th impression, Oxford University Press, New Delhi.

Cesaire, Aime (2000). *Discourse on Colonialism*, Translated by Joan Pinkham, Monthly Review Press, New York.

Chandra, Sudhir (1975). *Dependence and Disillusionment: Emergence of national consciousness in later 19th century India*, Manas publications, New Delhi.

Fanon, Frantz (1963). *The Wretched of the Earth*, Translated by C. Farrington, Grove Press, New York.

Fanon, Frantz (1968). *Black Skin White Masks*, Translated by Charles Lam Markmann, Evergreen Black Cat edition, 9th printing, Grove Press, Inc., New York.

Halhed, Nathaniel Brassey (1980). *A Grammar of the Bengal Language*, Ananda Publisher Private Limited, Calcutta.

Joshi, V. C. (1975) (edited). *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi.

Kamal, Abu Hena Mustafa (1977). *The Bengali Press and Literary Writing*, University Press limited, Dhaka.

Kopf, David (1969). *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, University of California Press, Berkley and Los Angeles.

Loomba, Ania (2001). *Colonialism/Postcolonialism*, reprint, Routledge, London and New York.

Memmi, Albert (1976). *The colonizer and The Colonized*, Translated by Howard Greenfeld, Beacon Press, Boston.

Nandy, Ashis (1989). *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under colonialism*, 2nd impression, Oxford University Press, Delhi.

Nandy, Ashis (1975). Sati: A nineteenth century tale of woman, violence and protest, *Rammohun Roy and the Process of Modernization in India*, Edited by V. C. Joshi, Vikas Publishing House Pvt Ltd, Delhi .

Said, Edward W. (1994). *Culture and Imperialism*, Vintage, London.

Spear, Percival (2004). *The Oxford History of Modern India 1740-1975*, 2nd edition, 21st impression, Oxford University Press, New Delhi .

Stokes, Eric (1959). *The English Utilitarians and India*, Oxford, Great Britain.

Thiong'o, Ngugi Wa (2007). *Decolonising the Mind*, Worldview Publications, Delhi.